



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-V, Issue-I, July 2016, Page No. 18-23

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণে বিবেকানন্দ

সুজিত দেবনাথ

এম.এ., সেট, নেট, জে.আর.এফ. (আর.সি.পি.আর), গবেষক দর্শন বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

পূজা দাস

এম.এ : সেট (SET), ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

In this paper I made an attempt to discuss how Swami Vivekananda tries to remove inequality in caste from society. Vivekananda thinks that inequality in caste in modern India is a big obstacle in the development of our society. In India caste or varna system means fourfold division of society namely Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. According to Vivekananda caste is not by birth rather it is based on quality of people. It is men who made them traditional. And gradually one caste starts to predominate over other castes. He believes that one time is coming when the weaker class will dominate over other castes. But he does not want such a society where one caste dominates over other castes. Vivekananda talks about an age when everyone was Brahman and he says that we are now live in a degenerate age. But we can get that golden age back if we strive hard enough. Swami Vivekananda wants complete annihilation of this caste system and he tries to harmonize the people through this annihilation of caste. Thus, in my writing I shall try to discuss some of his great thinking to remove this inequality in caste from society.

Key words: inequality in caste, obstacle, dominate, golden age, strive hard, complete annihilation.

ভূমিকা

ভারতীয় সামাজিক ধারার ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলে সভ্যতার এক এক স্তরে এক এক বর্ণের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোচনায় বিবেকানন্দ তার বক্তৃতা ও রচনাবলীতে অসংখ্যবার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পৃথিবীতে সাধারণভাবে গুণগত বর্ণ ও জাতি চারটি যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এদের মধ্যে বিদ্যা চর্চা বা জ্ঞান চর্চা যারা করেন তারা ব্রাহ্মণ। যারা যোদ্ধা এবং দেশ শাসন করে তারা ক্ষত্রিয়। যারা ব্যবসায়ী তারা বৈশ্য। আর যারা কায়িক শ্রমের দ্বারা ভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করে তারা শূদ্র। বিবেকানন্দের মতে সমাজ ক্রমান্বয়ে এই চারটি বর্ণদ্বারা শাসিত হয়েছে। তবে প্রতিটি শাসন ব্যবস্থায়ই শোষণ অব্যাহত থাকে। স্বামীজির মতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসনে শোষণ সর্বাত্মক দেখা যায় না তা হয় ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা বড়জোর গোষ্ঠীগত। কিন্তু বৈশ্য শাসন ব্যবস্থায় এই শোষণকারীর ক্ষমতা হয় বড়ই ভয়াবহ। এই শাসন ব্যবস্থায়

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে তারা তাদের গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থে শোষণ চলায় অধিক মাত্রায়। স্বামীজি মনে করেন এই বৈশ্য শাসন ব্যবস্থার পরবর্তীকালে কালের পর্যায় ক্রমিক নিয়মানুসারে শূদ্র শাসন যুগের আবির্ভাব হবে। তিনি মনে করেন প্রথম তিনটির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) পালা শেষ হবার পর শূদ্র যুগ আসবেই আসবে- এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে ক্ষেত্রে শূদ্র শব্দটিকে মজুর অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। শূদ্র শাসন ব্যবস্থায় গরীবরা তাদের অসমান জীবন সংগ্রাম থেকে অনেকটাই সুবিধা পাবে। কিন্তু বিবেকানন্দ এই শূদ্র শাসন ব্যবস্থাকে সবচেয়ে উন্নত একটি শাসন ব্যবস্থা বলেননি। বরং তার ইচ্ছা হল সমাজের প্রতিটি বর্ণ যখন তাদের নিজ নিজ কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে এক উন্নত চিন্তায় পৌঁছতে পারবে তখন সেই ব্যবস্থাটাই হবে আদর্শ সমাজ। এইভাবে আমি আমার এই আলোচনাতে দেখাতে চেষ্টা করব যে বিবেকানন্দ কিভাবে বর্ণ বৈষম্য উচ্ছেদের মাধ্যমে এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা করেছেন।

বিভিন্ন বর্ণ শাসিত শাসন ব্যবস্থা

বিবেকানন্দ মনে করেন ভারতবর্ষ সমাজ ব্যবস্থার তিনটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়েছে। এই তিনটি বর্ণ হচ্ছে পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়) ও ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং তিনি মনে করেন আরেকটি শাসন যুগের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবি সেটি হচ্ছে শূদ্র শাসন বা মজুর শাসন।

এই চারটি বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে সমাজ ব্যবস্থার আদি অধ্যায়ে রয়েছে ব্রাহ্মণ শাসন, ব্রাহ্মণরা মানব সভ্যতার সৃষ্টিকারী ত্যাগ, তপস্যা ও বিদ্যায় এই ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ। এই পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ শক্তির ভিত্তি নির্ভর করে বুদ্ধিবলের উপর বাহু বলের উপর নয়। এইজন্য পুরোহিত দিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাবের হয় বিদ্যাচর্চার। তখন তাদের সেই বিদ্যা ও চিন্তার স্থানে সাধারণের প্রবেশ ছিল অনেকটাই অসম্ভব। সত্ত্বগুণ প্রধান পুরুষেরাই সেই রাজ্যে থাকেন বার্তা আনেন ও অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। আর এই সত্ত্বগুণ প্রধান পুরুষেরাই হলেন পুরোহিত। মানব সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক। কিন্তু এই পুরোহিত শাসনে গুণ যেমন আছে তেমনি দোষ ও যথেষ্ট। বিবেকানন্দের মতে পুরোহিত শাসনে বংশগত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করছিল। তাদের ও তাদের বংশদরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারিদিকে গন্ডি দিয়ে রেখেছিল। তাছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও ছিল না। প্রণবরঞ্জন ঘোষের ভাষায়, প্রাচীন শাস্ত্রের বা ঐতিহ্যের প্রামাণ্য ধরে যে শাসন ব্যবস্থার উপর প্রজাদের সম্মিলিত ইচ্ছার কোন প্রভাবই থাকতো না। পুরোহিততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের একান্ত প্রভাবধীন প্রজাশক্তি, একান্ত ‘পালিত’ ও ‘রক্ষিত’ হয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা ভুলেই ছিল। আবার প্রাচীন যুগে রাজশক্তি ও প্রধানত পুরোহিত শক্তির অধীনে। ফলে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে গণশক্তিকে পদানত রাখা পুরোহিতদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।”^১ কিন্তু এই যুগের একটি অন্যতম গুরুত্ব এই যে পুরোহিতরা তাদের বুদ্ধিবলে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই পুরোহিত শক্তির সঙ্গে বহুকাল ব্যাপি পরশেষ পর্যন্ত রাজশক্তিরই প্রাধান্য দেখা দেয়। এই ক্ষত্রিয় শাসনের সময় ঐহিক সভ্যতার উন্নতি ঘটে। অরণ্য সভ্যতার স্থান অধিকার করে চারু ও চারুকলা সমন্বিত নাগরিক সভ্যতা। এই সভ্যতার প্রকৃতির কানন, জঙ্গল শূল বেশ ভূষাদির স্থান অধিকার করতে লাগে। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রম বহুল কৃষিকার্য ত্যাগ করে অল্পশ্রমসাধ্য ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করে। এই সভ্যতার শ্রমের গৌরব লুপ্ত হয়ে নগর সভ্যতার আবির্ভাব হতে শুরু হয়। এই ক্ষত্রিয়রা বিজ্ঞান স্বাধীনতার পরিপোষক, দেশ-থেকে কুসংস্কার দূরীকরণের পক্ষপাতী। ক্ষত্রিয়রা যখন জ্ঞান চর্চা করেছেন তখন সর্বোচ্চ তত্ত্ব তাদের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে। তারা উপনিষদ গীতার প্রবক্তা। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এরা সবাই ক্ষত্রিয় ছিলেন। স্বামীজির মতে, ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় নৃপতির অধীনেই পরবর্তীকালে একাধারে দার্শনিক ও শাসক। পৌরাণিক যুগের রাম বা কৃষ্ণ এবং ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধ বা মহাবীর- এরা ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধি।”^২ ক্ষত্রিয়রা ভোগবাদী সভ্যতার যেমন প্রবর্তক, তেমনি তারাই ভোগে বীতস্পৃহ হয়ে ভোগ বৌরাগ্য তত্ত্ব প্রবর্তন করেছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন “ক্ষত্রিয়রাই চিরকাল ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ; তারাই

বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার পরিপোষক। দেশ থেকে কুসংস্কার দূরীভূত করার জন্য বারংবার তাদের ব্রজকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে আর ভারত ইতিহাসের প্রথম তারাই পুরোহিত স্কুলের অত্যাচার হেকে সাধারণকে রক্ষা করার অভ্যেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।”^৩ ভারতের মুসলমান রাজত্ব এই ক্ষত্রিয় শাসনের উদাহরণ। ক্ষত্রিয় শাসন যুগে যদিও শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির চরম উন্নতি সাধন হয় কিন্তু এই ক্ষত্রিয় শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচার পূর্ণ যা আমরা ইতিহাসের পাতায় সদাই দেখতে পাই।

কালক্রমে দেখা দেয় বৈশ্য শাসনযুগ, ব্রাহ্মণ যেখানে বিদ্যা বলের অধিকারি দাবী করে, ক্ষত্রিয় বাহুবলের অধিকার জানায়, সেখানে বৈশ্যের বক্তব্য প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন “বৈশ্য বলিতেছেন উন্মাদ! অশুভ মন্ডলাকার; ব্যাণ্ড; যেন চরাচর; -তোমরা যাহাকে বলো, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ! তোমার তপ জপ বিদ্যাবুদ্ধি ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ তোমার অস্ত্র সস্ত্র, তেজ বীর্য-ইহারই কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যন্ত কারখানা সকল দেখিতেছ, ইহারাই আমার মধুক্রম। ঐ দেখ অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্ণ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু সে মধু পান করিবে কে? আমি যথাকালে আমি পশ্চাদেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।”^৪ স্বামীজির মতে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের অবসানে ইংরেজরা তথা বণিক শ্রেণির যে শাসন শুরু হয় সেটাই হল বৈশ্য শাসন। তাঁর মতে বৈশ্যদের বাণিজ্যের দ্বারা শুধু ইংল্যান্ড প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি দিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় স্বামীজি কেবল ধনতান্ত্রিক ইংরেজ জাতিকে বৈশ্যজাতি বলেননি। বরং তিনি অন্য কয়েকটি জাতিকে ও তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্বামীজির মতে এই বৈশ্য শাসন ব্যবস্থার বাইরে যদিও প্রশান্ত ভাব কিন্তু এর শোষণকারী ক্ষমতা বড়ই ভয়াবহ। স্বামীজির মতে, এর ভেতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্ত শোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব বড়ই ভয়াবহ।^৫ বিবেকানন্দ বৈশ্য শাসনের শোষণের একটি দিককে উদঘাটিত করতে গিয়ে বলেছেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শাসনে শোষণ সর্বাঙ্গিক থাকে না তা হয় ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা গোষ্ঠীগত। কিন্তু বৈশ্যরা একটি বিরাট সম্প্রদায়, তাই এক্ষেত্রে শোষণের মাত্রা হয় অধিক। তাছাড়া বৈশ্যরা সম্রাজ্যবাদী হওয়ায় তাদের শোষণের মাত্রা হয় সর্বাধিক। স্বামীজি বলেন, “ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসনে শোষণ সর্বাধিক ছিল না- তা ব্যক্তিগত, পরিবারগত, বড়জোর গোষ্ঠীগত। কিন্তু বৈশ্যরা একটি বিরাট সম্প্রদায়, সুতরাং গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থে শোষণ করা হয়। আবার বৈশ্য শাসন যখন সম্রাজ্যবাদী, তখন একটি গোটা জাতির স্বার্থে পরাধীন জাতিকে শোষণ করা হয়।”^৬ বিবেকানন্দ মনে করেন, যেহেতু প্রতিটি শাসন যুগেই শোষণ অব্যাহত তাই কালের পর্যায়ক্রমিক নিয়মে শূদ্রশাসন বা শ্রমিক শাসনের আবির্ভাবে হবেই। তিনি বলেন যেহেতু প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে তাই এবার শেষেরটির পালা। শূদ্রযোগ আসবেই। স্বামীজির ভাষায়, “ইতিহাসের আমোঘ বিধানে শূদ্র শাসন আসবেই।”^৭ এই শাসন ব্যবস্থায় গরিবরা অনেকটাই সুবিধা পাবে। বিবেকানন্দের এরূপ মন্তব্যের সাথে সমাজতন্ত্রের (socialism) একটা বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়। সর্বহারাদের একনায়কত্বের যে ভবিষ্যবাণী মার্কস ও এঙ্গেলস করেছিলেন তার সঙ্গে বিবেকানন্দের এই মন্তব্য তুলনীয়। অর্থাৎ মার্কস ও এঙ্গেলস যেমন উন্নতমানের সমাজ তথা শ্রমিক শোষণের কথা চিন্তা করেছেন তেমনি বিবেকানন্দ ১৮৯৬ বা তার আগে থেকেই শূদ্র প্রাধান্যের কথা চিন্তা করেছেন। যদিও বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রবাদকে সর্বোচ্চ মতবাদ বলেননি বরং তিনি সেখানে প্রচলিত অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত ভালো মনে করেছেন।

স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাবী শূদ্র শাসনে দোষ গুণ উভয়ই থাকবে। এই শাসন ব্যবস্থার দোষ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন হয়তো এই শাসন ব্যবস্থার সংস্কৃতির অবনমন হবে, এবং অসাধারণ প্রতিভাশীল ব্যক্তির সংখ্যা কমে যাবে। কিন্তু তদুপরি তিনি এরমধ্যে ধনীর শোষণ থেকে দরিদ্রের মুক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই ইহজগতে বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শূদ্র শাসন তার কাছে স্বীকার্য। তাই তিনি একে স্বাগত জানাতে গিয়ে বলেছেন “নতুন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের বুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান হতে, ভূনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে,

বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে নীরবে সয়েছে- তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে- তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্ত বীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার- বল যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি ফেলে দাও এদের মধ্যে। যত শীঘ্র পার ফেলে দাও। আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমুতস্যান্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি-“ওয়াহ গুরু কি ফতে।”^৮

স্বামীজির উপরিউক্ত বাক্যগুলির দ্বারা তাঁর অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণির প্রতি ভালবাসাই ফুটে উঠেছে। যদিও তিনি এই শূদ্র শাসনকেও একমাত্র সর্বোচ্চ শাসন ব্যবস্থা বলেননি। তবুও তিনি বলেছেন এই শাসন ব্যবস্থায় অবহেলিত নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণি তাদের অধিকার ফিরে পাবে। তাই তিনি ভাবি শূদ্র শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রাজাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে, তাহানহে, শূদ্রধর্ম- সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।”^৯

বর্ণ-বৈষম্যহীন ও এক উন্নত সমাজেই বিবেকানন্দের লক্ষ্য

অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে শূদ্র শাসনকে যদিও তিনি উন্নত পর্যায়ে বলেছেন তবুও শূদ্র শাসনকে কখনই তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বলে মনে করেননি বরং তিনি বলেছেন শূদ্র বা সর্বহারাদের যুগে যদি সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ না হয়, তাহলে এর ও পরিবর্তন হতে পারে।”^{১০} তাছাড়া তিনি নিজেই বলেছেন যে শূদ্র শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত হলেও এই শাসন যুগে সংস্কৃতির অবনমন ঘটে। স্বামীজি বলেন, “শূদ্রযুগে সংস্কৃতির মান অবনমিত হবে।”^{১১} তাই শূদ্র শাসন ব্যবস্থা ও তার কাম্য নয় বা তার মতে এটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা নয়। এই ভারতবর্ষের বর্ণ, ভাষা, ধর্মসংস্কার এবং সামাজিক উচ্চভিলাষ প্রভৃতির বিপরীত প্রভাবে বিবদমান গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন। তিনি মনে করেন এই ভারতবর্ষকে বিরাট সংঘবদ্ধ জাতিতে গড়ে তোলাই হল প্রকৃত সমস্যা। বিবেকানন্দ বলেন এই বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠী চিরকালেই রয়েছে ও থাকবে। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সদগুণ গুলির সমন্বয়ে এক নতুন আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং জগতের ইতিহাসে যতই শ্রেণিতে শ্রেণিতে সংগ্রাম, বিভিন্নতা থাকুক না কেন বিবেকানন্দের লক্ষ্য হল সবজাতির মধ্যে সমন্বয় সাধন। সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা তিনি করেছেন। বিবেকানন্দের সর্বশ্রেণির শ্রেষ্ঠ দিকগুলির সমন্বয়ের কল্পনাটি ও সেরূপ একটি বৈষম্যহীন, শোষণহীন এক উন্নত সামাজিক চিন্তার পরিচায়ক।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ইহা স্পষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ কোন একটি বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণির শাসন ব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা বলেননি। বরং স্বামীজির ভবিষ্যৎ দৃষ্টি শূদ্র যুগকে ও অতিক্রম করে গেছে। আদর্শ ব্রাহ্মণকে আদর্শ মানব রূপে কল্পনা করে তিনি বলেছেন সমস্ত জগৎকে ব্রাহ্মণের আদর্শে গড়ে তোলাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত। এখানে ব্রাহ্মণ শব্দটি ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সচেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন “... আবার যখন যুগচক্র ঘুরে সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হবেন।”^{১২} বিবেকানন্দ দেশের দরিদ্র, পতিত ও অশিক্ষিতের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নতুন ভারতের সম্ভাবনা দেখেছেন বেশী। তাই সকলকে ব্রাহ্মণের আদর্শে গড়ে তোলার কথার দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রতিটি পিছিয়ে পরা জাতিকেই

এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সবগুলো বর্ণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। যখনই প্রতিটি বর্ণ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবে তখনই গড়ে উঠবে একটি আদর্শ সমাজ। স্বামীজির এই উক্তিটি প্লেটোর কার্ডিনাল ভার্চুর আলোচনার সাথে তুলনীয়। যেখানে প্লেটো বলেছেন সমাজে জাস্টিস তখনই স্থাপিত হয় যখন অন্য জাতিগুলি ঠিকভাবে তাদের কর্তব্য পালন করে। প্লেটোর মতে, “It is realized when the rulers govern wisely, the soldiers fight bravely, and the craftsmen and traders work with energy and thrift.”^{১৩} এইভাবে বিবেকানন্দ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনায় রয়েছেন, “যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ এই সব গুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষ গুলি থাকবে না, তাহলে তা হবে একটি আদর্শ রাষ্ট্র।”^{১৪} এইভাবে বিবেকানন্দ সমাজব্যবস্থা থেকে বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে এবং প্রতিটি বর্ণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যম একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেছেন।

তথ্যসূচি

- ১) ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৩৬৭।
- ২)ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬৬।
- ৩)বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মডল বুক হাউস, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৪৪৬।
- ৪)ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫০।
- ৫) ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী কলকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৪৫০।
- ৬) বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মডল বুক হাউস, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৪৫০।
- ৭) ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫১।
- ৮) ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫৪।
- ৯) স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, নাভানা প্রিন্টিং; ওয়ার্কাস প্রাইভেট লিমিটেড ৪৭ গনেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা- ১৩, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-২৪১।
- ১০) ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী কলকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৩২৮।
- ১১) ঐ, পৃষ্ঠা-৩২৭।
- ১২) পৃষ্ঠা-৩৪৪।
- ১৩) sinha, jadunath, A Manual of ethics, New Central Book Agency, (P) Ltd., Kolokata, 2009, p. 295.
- ১৪) বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মডল বুক হাউস, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৪৫৫।

গ্রন্থপঞ্জী

- দত্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ নব ভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯, ১৩৮৩।

- ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী কলকাতা-১২, তৃতীয় সংস্কারণ-১৩৮৫।
- বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মন্ডল বুক হাউস, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩।
- স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, নাভানা প্রিন্টিং; ওয়ার্কাস প্রাইভেট লিমিটেড ৪৭ গনেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা-১৩ ১৯৭৭।
- স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, উন্ডোখন কার্যালয় কলকাতা, ১৯৭৭।
- Sinha, Jadunath, A Manual of ethics, New Central Book Agency, (P) Ltd., Kolokata,
- 2009.